Semester – II-(PG)
Paper-201
State and Economy in Colonial India
(Unit-I)

Analyse the basic features of the Regulating Act 1773.

Or

To what extent did the Regulating Act help in providing a constitutional and legal framework for Company's administration in India?

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি হয়ে ভারতে বাণিজ্য করার ছাড়পত্র পায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। নিয়তির বলে কিছুদিনের মধ্যেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত বাণিজ্যিক গোষ্ঠী পরিণত হয় শাসকে। অনেকটা আর্থিক নিয়ন্ত্রণের তাগিদ থেকেই। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, এই ঘটনাকে ব্যখ্যা করেছেন- 'বাণিজ্য রূপান্তরিত হল রাজনৈতিক আধিপত্যবাদে'। শুরু হল ভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা। দ্বৈত শাসন। অনিয়ন্ত্রিত রাজস্ব আদায় এক কথায় বলা যায় লুঠ। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এটাকে 'পলাশী লুন্ঠন' বলে উল্লেখ করেছেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র বাণিজ্যের প্রসারের ফলস্বরূপ বাংলায় শুরু হয় ১৭৭০ এর মন্বন্তর। যেটা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামেও পরিচিত। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এই আর্থিক সংকট উন্মোচিত হয়। এই ঘটনা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতপ্রেমী মানুষদের কাছে চিন্তার উদ্রেক করে। এখান থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে বেছে নেয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই মনোভাবে ফল স্বরূপ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর প্রতি ১৭৭৩ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করে যা ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং আইন নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কোম্পানীর ভারত শাসন ব্যবস্থায় রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশের মাধ্যমে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। ১৭৫৭'র পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী লাভ প্রভৃতি ঘটনায় বাংলা দূর্গতি আসন্ন হলেও কোম্পানির বা কোম্পানির কর্মচারীদের কোষাগার যে পূর্ণতা পায় তা বলা বাহুল্য। নবাবকে নিয়ন্ত্রণ, জোরপূর্বক রাজস্ব আদায় ও ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর অধিকার বিস্তার বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কৃষকদের অবস্থা অসহনীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। তৎসত্ত্বেও কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার, ক্রমাগত যুদ্ধ চলার ফলে কোম্পানির আর্থিক সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঋণের জন্য দারস্থ হয় কোম্পানি। ব্রিটিশ সরকার ঋণের মাধ্যমে কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়। ভারতে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলের ওপর ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন থেকেই কোম্পানির আর্থিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে আইনের মাধ্যমে কোম্পানির রাজনৈতিক শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৭৩ এর ভারত শাসন আইনের উদ্দেশ্য ছিল – ইংল্যান্ড ও ভারতে কোম্পানির শাসনের উন্নতি করা। এছাড়া –১. ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক তৈরি করা।

২. কোম্পানির ডিরেক্টর সভার পুনর্গঠন করে ভারতের শাসনের ওপর এর নিয়ন্ত্রন স্থাপন করা।

৩. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রিত ভারতে একটি কেন্দ্রীয় শাসন গঠন করা।

১৭৭৩-এর রেগুলেটিং আইনে বলা হয় – ১. ইংলেন্ডের পরিচালক সভার নিয়ম বিধি পরিবর্তন করা হয়। এবং বলা হয়- ১০০০ পাউন্ডের শেয়ার হোল্ডাররাই শুধু ভোটদানে অধিকারী হবেন। আর কোন ব্যাক্তি সম্পত্তির নিরিখে সর্বাধিক চারটে ভোট দিতে পারবেন। এই ডিরেক্টর সভার আয়ু হবে চার বছর। এছাড়া ইংলেন্ডে দু বছর কাটানের পর ভারতে ডিরেক্টর হিসাবে মনোনীত হতে পারবেন।

২. ভারতে শাসনের জন্য একজন গভর্নর ও চার সদস্য বিশিষ্ট্য কাউন্সিল থাকবে। তবে ডিরেক্টর অতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করবে।

৩. কলকাতার গভর্নর হবেন অন্যান্য প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিধান্ত গ্রহনকারী ও হস্তক্ষেপের অধিকারী। আর কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ব্রিটিশ সরকারের কাছে শাসন সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

৪. এই আইনের দ্বারা একজন বিচারপতি ও তিনজন সহ-বিচারপতি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে একটি 'সুপ্রিম কোর্ট' স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন স্যার এলিজা ইম্পে। তবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর গর্ভনর জেনারেলদের কোন নিয়ন্ত্রন থাকবে না বলে উল্লেখ করা হয়।

৫. এই আইন কোম্পানি কর্মচারীদের অনুদান, উৎকোচ বা উপহার গ্রহন না করার নিদান দেয়। মূলত এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে শাসনব্যবস্থা স্থাপন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতের মত উপনিবেশে কোম্পানির শাসনকে সাংবিধানিক পথে পরিচালিত করা প্রথম প্রয়াস হল ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট। ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষা করার একটা ক্ষীন প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। কোম্পানীর শোষন ও কর্মচারীদের অত্যাচারের হাত থেকে বের করার একটা ভূমিকা পালন করেছিল এই রেগুলেটিং আইন। আইনের সফলতা লক্ষ্য করে স্মিথ বলেন – রেগুলেটিং আইন দ্বারা মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ওপর বাংলার প্রেসিডেন্সীর কর্তৃত্ব নির্ধারিত হয়। আর কীথ এই আইন সম্পর্কে মূল্যায়ন করে মনে করিয়ে দেন যে – এই আইন দ্বারা একটি সৎ ও দক্ষ প্রশাসন ও আইনানুগ কর্তৃপক্ষ গঠনের চেষ্টা করা হয়।

তৎসত্ত্বেও এই আইনের দূর্বলতা নিয়ে সমালোচনা করা হয়। পার্লামেন্ট এই আইন প্রয়োগ করেও কোম্পানিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বলে সমালোচনা করেন P.E. Roberts। তিনি বলেন 'It was a half measure disastrously vague on many points'। এই বিধিতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কথা নিয়ে আলোচনা করা হলেও নবাব বা ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থান নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব। এখানে গুরুত্ব পায় কোম্পানির শাসন ব্যবস্থার নানাদিক। এখানে স্পষ্ট ছিল না কোম্পানির ডিরেক্টর ও তাঁর পরিষদের ক্ষমতার কথা।

সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হলেও এই প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ার নিয়ে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। সুনির্দিষ্ট আইনের বিধান নেই। প্রচিলিত হিন্দু আইন, মুসলিম আইন ও খ্রীস্টান আইনের প্রয়োগ নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে যায়। হারবার্ট কাওরেলের মতে – এই আইনের বলে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। বিচারকদের হাতে দেওয়া হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা। তবে ইংল্যান্ডের শাসক-এর দ্বারা কোম্পানীর প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার ফলস্বরূপ তৈরি হয় ১৭৮৪ সালে পিটস্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট।

কোম্পানির প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণীত হলেও লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। প্রয়োগের সময় এই আইনের দূর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এটা অভিনব উদ্যোগ ছিল তা বলাই যায়। ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনের দিকে লক্ষ্য রেখে আইন রচনা করার প্রথম প্রয়াস বলে, বলা যেতে পারে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম প্রচেষ্টা এই আইনের মধ্যদিয়েই হয়েছিল। তাই ঐতিহাসিক লায়াল এই আইনের মূল্যায়ন করে বলেন- কোম্পানি অস্পষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিকল্প হিসাবে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্বীকৃত শাসনের রূপরেখা প্রস্তুত করার ও বাস্তবে রূপদান করার একটা প্রথম প্রচেষ্টা যে এই আইন তা বলা যেতে পারে।